Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-III, April 2023, Page No.23-29
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার অর্থনীতি এবং সামজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের আধার হিসেবে মন্দিরের ক্রমবিবর্তন

Sajal Ojha
M.A (History) M-Ed (Pursuing) WBUTTEPA, Westbengal, India

Abstract:

The paper discusses the rise of the Bengali race and the evolution of religion, temples and idol worship in the Bengal, showing how the present day Bengali race was created through the socio-cultural amalgamation of non-Aryan and mixed Aryan castes. The nature of formation of Bengali thought is realistically shown by discussing how the socio-economic-cultural evolution from religion to temple establishment and thence is presented in historical context. Not only that, it shows how Bengalis used to sacrifice their lives for religion. Here various temples of West Bengal are classified and the economic structure and employment of each category is shown. Several theoretical and data-based discussions of how temple culture strengthened Bengal's economy are presented here, which help the reader will understand how the socio-economic sphere is interrelated with religion and temple culture. In this research paper an attempt has been made to carry out the work in deductive method by collecting primary and secondary data. The essay discusses the topic in a historical context so that the reader can make a connection between the past and the present.

Key Words: **Geographical Entity, Religious Culture, Clouds, Fiery Thunder, Values.**

শিরোনামের বিষয়টিকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পাঠককে কয়েকটি বিষয়ে যেমন, বাংলা ও বাঙালির মননের ভৌগলিক সত্ত্বা, এবং বাঙালির মন্দির তথা ধর্মীয় সংস্কৃতির ভিত্তি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়গুলির সম্যক আলোচনার মাধ্যমেই আলোচ্য বিষয়টির বোধগম্যতা ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়। প্রথমেই আলোচনা করা যাক বাংলা ও বাঙালির মননের ভৌগলিক সত্ত্বা সম্পর্কে। আধুনিক বাংলা বা বাংলাদেশ পুরাকাল থেকেই বারেন্দ্রী, পুরাকাল, বঙ্গ ও কামরূপ - এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। রাঢ় বলতে সাধারণত 'গৌড়, বারেন্দ্রী বলতে উত্তর-পশ্চিম বাংলা, বঙ্গ ও কামরূপ বলতে যথাক্রমে দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপূর্ব বাংলা বোঝাত। মৌর্য শাসনের সময় থেকে অর্থাৎ আনুমানিক খ্রি:পূ: ৩০০ অব্দ থেকে এই অঞ্চলে আর্যিকরণ শুরু হয় এবং তা আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিল। এই পদ্ধতি চলে দীর্ঘদিন ধরে। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন: "...অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য- এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হল। ... রক্তে ও ভাষায় আদিম বাঙ্গালী মুখ্যত অনার্য ছিল। ... কিন্তু আর্যভাষার সঙ্গে সঙ্গে সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি একটা নূতন মানসিক নীতি বা বিনয়- পরিপাটি, যাহাকে ইংরেজিতে discipline বলে তাহা পাইল; বাঙ্গালীর অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রকৃতির উপরে আর্য মনের

ছাপ পড়িল। ... এই ছাপটুকু, আদিম অপরিস্ফুট বাঙ্গালীকে একটা চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য দিল।" উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানের ভাষায় সঙ্কর প্রজাতি সর্বদাই উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, এক্ষেত্রে বাঙালীকে সঙ্কর-জাতী বলাটা খুব একটা অমূলক নয়। বাংলার জল, স্থল, ও আকাশে ষড়ঋতুর অপূর্ব শোভা-বৈচিত্র্য, কখনও নীলাভাস মেঘসম্ভার, কোথাও বা স্নিগ্ধ শীতল জলধারা, আবার কখনও অগ্নিসম বজ্রধারা শুধু বাংলাই নয়, বাঙালির অন্তঃসত্ত্বাকে গড়ে তুলেছে।

মানবসভ্যতায় বিভিন্ন নির্ধারক থাকে যেমন- ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগলিকতা ও ধর্ম, যা সমাজকে এক সুতোয় গাঁথতে সাহায্য করেছে সেই পুরাকাল থেকেই, তবে গবেষণাতে দেখা গেছে এর মধ্যে ধর্ম হল সবথেকে শক্তিশালী নির্ধারক যা ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনজাতিকেও ঐক্যবদ্ধ করে। একইভাবে মানবসভ্যতায় আর্থসামাজিক উন্নতিতে সবথেকে প্রভাবশালী একটি নির্ধারক হল ধর্ম। এই ধর্মেরই তথাকথিত একটি কাঠামোগত বাহ্যিক রূপ হল বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। আধুনিক যুগে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এতটাই প্রতিপত্তিশালী সংগঠন হয়ে উঠেছে, যা মুখ্যত মানবজাতির সর্বক্ষেত্রে নির্ধারক হিসেবে কাজ করে এবং এটি মানব ইতিহাসে বারংবার উঠে এসেছে। ষোড়শ শতাব্দীর একটি পদ্যের উদ্ধৃতি থেকে বাঙালির ধর্মীয় ভাবাবেগের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়:

চন্দ্রশেখর নাম বৈদ্য আছিল খণ্ডেতে,
যার বসতবাটি খণ্ড ক্ষেত্রের তলাতে।
রসিকরায় বিগ্রহ তার সেবা অতিশয়,
স্বর্ণ- ঠাকুর বলি মোগল বেঢ়িল আলয়।
বক্ষে রাখিলা ঠাকুর তবু না ছাড়ীলা,
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিলা।।

শ্রী চৈতন্যের এক প্রধান ভক্ত শ্রীখণ্ড বাসী নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন বৈদ্য চন্দ্রশেখর, তিনি খুব ধূমধাম করে রসিকরায় বিগ্রহের পূজা করতেন।মন্দিরের ঐশ্বর্যে মোগল সেনারা আক্রমণ করল এবং বিগ্রহে সোনার অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যতা দেখে সেনারা ঠাকুরের মূর্তিটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নিলে, চন্দ্রশেখর মূর্তিটিকে বাঁচাতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ দিলেন। অর্থাৎ এইসমস্ত সাহিত্যিক উপাদান থেকে এটা স্পষ্ট যে, মঠ, মন্দির প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির কাছে এক ভাবাবেগের কেন্দ্র বিন্দু ছিল যা বাঙালি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রকে কমবেশি নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে যা আরও ক্রমবর্ধমান -রাজনীতি থেকে শুরু করে সামাজিক সাংস্কৃতিক,অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে।[1]

এখন আসি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ 'মন্দির'- এর প্রসঙ্গে আর মন্দিরের সাথে সমোচ্চারিত হয় বিগ্রহের কথা, তাই আমরা একইসাথে সংক্ষেপে এর বিবর্তিত রূপটি আলোচনা করব। পুরাকাল থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে মূর্তি পূজার কোন প্রচলন ছিলনা, তারা প্রকৃতি পূজো করত, যেমন- অগ্নি, বায়ু, জল ইত্যাদি, যা সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এক্ষেত্রে আমাদেরকে বুঝতে হবে মূর্তি পুজো শুরু হয় পুরাণ যুগ থেকে এবং তা বৈদিক আচরণের বিরুদ্ধ নয়, বরং এটি বৈদিক সত্যকে প্রত্যক্ষ রূপে একটি বিশেষ কাঠামোগত রূপ দিল, সমাজের সাধারন মানুষের বিশ্বাস ও বোধগম্যতাকে আরও দৃঢ় করতে।[2]

[1] মধ্য যুগের বাঙলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন পৃ. ৫।
[2] Radhakrishnan, "Religion and Society". George Allen and Unwin Ltd., London, 1947, page 125.

দেবীভাগবাত পুরাণ বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় আচরণের ওপর ভিত্তি করে মানব গোষ্ঠীকে চারটি বিভাগে সজ্জিত করে, যার তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মানব গোষ্ঠী বিগ্রহ পূজা করেন। প্রসঙ্গত, দার্শনিক আচার্য রজনীশ মন্তব্য করেন যে, মূর্তি কিন্তু ভগবানের অনুরূপ নয়, তবে এর মধ্যে একটি ঐশ্বরিক বিশেষ অনুভূতি বর্তমান। মানুষ যখন মূর্তি বা বিগ্রহ দর্শন করতে আসে তখন মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ স্পন্দিত ঐশ্বরিক অনুভূতি জেগে ওঠে যা ক্রমাগতভাবে মনের মধ্যে গৃহীত হয়। ঠিক যেমন সবুজ অরণ্যে গেলে মানুষের অন্তরে একটা সবুজ সজীব স্পন্দন বা অনুভূতি হয়। ঠিক এটিই মূর্তি পূজার যৌক্তিকতা, যা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত।[3] এক্ষেত্রে কয়েকজন গবেষক মন্তব্য করেন যে, মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে দ্রাবিড় সংস্কৃতি আর্যদের প্রভাবিত করেছিল, যেমন - উপজাতি অঞ্চলগুলিতে আজও কাঠ অথবা পাঁথরের দণ্ড পুজিত হয়, এইভাবেই দেখা যায় যে হিন্দু ধর্ম একটি মিশ্র সংস্কৃতি যা মূলত সনাতনি ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রাচ্যবিদ F.E. Paragiter মন্তব্য করেন যে, আর্যরা অনার্যদের ওপর শাসন করতে এসে দীর্ঘ সহাবস্থানের দরুন তারা ক্রমান্নয়ে অনার্যদের ধর্মীয় আচরণ ও বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের মধ্যে একটি বিবর্তিত সত্ত্বা গড়ে ওঠে।[4] এইভাবেই বিবর্তিত হয়ে আজকের মূর্তি পূজার বর্তমান রূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে। জনসম্প্রদায় এই মূর্তিকে কখনও গুহায়, গাছে, কখনও বা কাঠ, ইট, পাথরের দ্বারা তৈরি কাঠামোতে প্রতিষ্ঠা করা হত, যা 'মন্দির' নামে পরিচিত। মন্দিরের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন যে, মন্দিরের প্রয়োজনকে অস্বীকার করার অর্থ ঈশ্বর, ধর্ম, এবং লৌকিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।[5] নিঃসন্দেহে জনজাতি বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তার সমস্ত সৃষ্টিতেই সর্বত্র বিদ্যমান। তবে জনজাতির বেশিরভাগ সদস্য দার্শনিক নয়, তারা প্রকৃতিগতভাবে সাংসারিক জীব, তারা অদৃশ্য ঈশ্বরের কেবলমাত্র কল্পনাতেই তৃপ্ত নয়। সুতরাং তাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের একটি শরীরী উপস্থিতি যা দর্শনীয় ও বোধগম্য, আর যার আবাস হল মন্দির। হিন্দু ধর্মের দৃশ্যমান প্রতীক হিসেবে মন্দির এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। মন্দিরগুলির স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ যেমন- প্রদীপের নির্মলতা, ধূপধুনোর আধ্যাত্মিক সুগন্ধী, সংগীতের মায়াবী মাধুর্যতা, এবং সর্বোপরি বিগ্রহের এক অবর্ণনীয় প্রতিভাস এক আধ্যাত্মিক অনুভূতির সৃষ্টি করে, যা লৌকিক মনে এক শান্তি, স্থিরতা আনে যা বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ বায়ু। তাই বেশ কয়েকটি হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে মন্দির প্রতিষ্ঠা করাকে মহা পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করা হয়, এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন রাজা ও ধনী ব্যাক্তিরা বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে বড় বড় মন্দির গড়ে তুলেছে। উল্লেখ্য, হিউয়েন সাঙ-র বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তিনি সপ্তম শতাব্দীর সমগ্র বাংলাতে ভ্রমণ করে তিনশোরও বেশি মন্দির লক্ষ্য করেছেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত' গ্রন্থে শোণিতপুরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনার মধ্যে বলেছেন যে, এখানকার বহু মন্দির ভক্ত-উপাসকদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। নগরীটি ছিল 'মন্দিরপুরী'। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাচীনকালে এই মন্দিরগুলি ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব তথা সংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি হিসেবে ভিত্তি স্থাপন করে চলেছে। ক্রমাগত এই মন্দির গুলোকে কেন্দ্র করে সংঘটিত উৎসবের আলোকে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন

[3] Bhagaban Rajanish, "Tantra Vision: The door to Nirvan." Dimond Pocket Books(P) Ltd., 2715 Darya Gan.j, New Delhi - HOO02, 1993 Page 12-13.

[4] K.C.Mishra, "The Cult of Jagannath". Firma K.L. Mukhopadhya 6/1 a, Dhiren Dhar Sarani, Calcutta, 1971, Page 14.

[5] M.K. Gandhi, "The Necessity of Temples" Article in the Book "Symbolism in Hinduism" compiled by R.S. Nathan, Central Chinmaya Mission Trust, Bombay, 2nd Edition, 1989, Page 37

ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে ভাবগত ঐক্য তথা সামাজিক সম্পদ ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনের মাধ্যমে একটা যৌথ সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় যাকে জাতীয় ঐক্যর ধারকও বলা যায়। শুধু তাই নয়, একটি বাস্তবিক মূল্যবোধও কিন্তু প্রাথমিক পর্বে এই মন্দির, ধর্ম তথা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"- স্বামী বিবেকানন্দের এই আদর্শের উদ্ভাবন আধুনিক যুগে হলেও এর সঠিক প্রয়োগ কিন্তু প্রাচীনকাল থেকে মন্দিরকে কেন্দ্র করেই কার্যকর রূপ পায় এবং বর্তমানে যা আরও বিস্তারলাভ করেছে যেমন- কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, ইত্যাদি মন্দির গুলিতে দরিদ্র সেবা নিত্যদিন চলছে, বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় বস্ত্র বিতরণ করে যা দরিদ্র মানুষ গুলির কিছুটা সচ্ছলতা বজায় রাখে। এইভাবেই মন্দিরগুলি সামাজিক ন্যূনতম চাহিদা মিটিয়ে সামাজিক মূল্যবোধকে আরও দৃঢ় করে চলেছে।

ভারতবর্ষে মন্দির ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাচীনকাল থেকেই, যার স্বরূপ সমস্ত বিশ্বের সামনে উঠে এসেছিল গজনির সুলতান মামুদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দির থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ লূঠ করার কাহিনী থেকে। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়, বাংলাতে তুর্কী অভিযানের সময় বৌদ্ধবিহার ও ব্রাহ্মণ্য মন্দির গুলি আক্রমণ ও লূঠ করা হয়েছিল। এইসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে এটা প্রমাণিত যে, মন্দির গুলি ছিল একটা অর্থনৈতিক কেন্দ্রভূমি। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ধনকুবের ও রাজপুরুষদের মন্দির প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতা করার সূত্র ধরেই এখানে ধীরে ধীরে একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে, বিশেষত মন্দির পরিচালনার জন্য যে বিপুল পরিমাণে জমি দান করা হত এবং তাকে কেন্দ্র করে একটা কৃষক শ্রেণী বা কৃষি অর্থনীতি গড়ে উঠত, যা অগ্রহার ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এছাড়াও একটা পুরোহিতশ্রেণী সহ অন্যান্য সেবকরা মন্দিরকে কেন্দ্র করেই পরিবারের অর্থসংস্থান করতেন। এইভাবেই ক্রমবিবর্তিত হয়ে প্রকৃতপক্ষে মন্দির এক কর্মসংস্থান মূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে বর্তমানে যা আরও বৃহৎ ও দৃঢ় হয়েছে।

বাংলার কয়েকটি আঞ্চলিক মন্দিরের উত্থানের আলোচনার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। নদীয়ার মদনপুর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে, যমুনা নদীর তীরে অবস্থান 'বিরহী' গ্রাম। সেখানেই অবস্থান 'মদনগোপালের মন্দির'। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বহু বছর আগে ওই অঞ্চলের একটি বাঁধানো বটগাছের নীচে এক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব মদনগোপালের উপাসনা করতেন। তাঁর দেহত্যাগের পর ভক্তরা মদনগোপালের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে গ্রামবাসীদের অনুরোধে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন, শুধু তাই নয়, যমুনার অপর পারের একটি গ্রামও দেবোত্তর বা মন্দিরের জন্য দান করা হয়। মন্দিরের জন্য ভোগের চাল সেই গ্রাম থেকেই আসতো, সেই থেকে গ্রামের নাম হয় 'ভোগ পাড়া'। প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন মন্দিরটির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে মদনগোপাল, রাধিকা, বলরাম, জগন্নাথ- এর মূর্তি। নদীয়া জেলায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে যে বারোটি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বিগ্রহ রয়েছে, বিরহীর মদনগোপাল ও বলরাম তাদের মধ্যে অন্যতম। মন্দিরের কিছুটা দূরেই রয়েছে 'দোলমঞ্চ', প্রতিবছর সেখানে বিগ্রহ রেখে দোল উৎসব পালিত হয়, ভাইফোঁটার দিন মন্দিরের দেওয়ালে মহিলারা ফোঁটাও দিতেন, এখনও ওই বিশেষ দিনে এখানে মেলা বসে। স্থানীয়দের বিশ্বাস ওই গ্রামে ভাল ফসল হয় মদনগোপালের আশীর্বাদেই। তাই গ্রামবাসীরা ওই জমির প্রথম ফসল বা গাছের ফল প্রথমে মন্দিরেই নিবেদন করা হয়। [6]

[6] মহাপ্রভুর স্মৃতি আঁকড়ে, (২০২২, মার্চ ২৪) বর্তমান সংবাদ পত্র, ১২ ।

নবদ্বীপধাম থেকে নীলাচল যাওয়ার পথে শ্রী চৈতন্যদেব 'পায়া মেদিনীপুর' নামে একটি অঞ্চলে তিনি কিছুটা বিশ্রাম ও আহার গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই স্মৃতি আঁকড়েই সেখানে গড়ে উঠেছে মন্দির। এখানে চৈতন্যদেব "পায়া চৈতন্য" নামেই সমধিক পরিচিত। আবার স্থানীয় একটি জনগোষ্ঠী সূত্রে জানা গেছে, এই 'পায়া গ্রাম'-এ বাস করতেন একটি ব্রাহ্মণ পরিবার, তাঁদের ঘরের বিধবা মেয়েকে স্বপ্নে মহাপ্রভু দেখা দিয়ে বলেছিলেনঃ "দীঘার সমুদ্রে একটি কাঠ ভেসে এসেছে। সেই কাঠ থেকে মূর্তি তৈরি করে তুই আমার পূজো কর"। সেই অনুযায়ী ওই বিধবা মেয়েটির দ্বারাই কুঁড়েঘরেই মহাপ্রভু পূজিত হতেন। গ্রামবাসীদের চোখে পরায় একটি ছোট মন্দির তৈরি করা হয়। বর্তমানে পাশেই বিশালাকার মন্দির তৈরির কাজ চলছে। স্থানীয়দের কাছে যেমন শ্রী চৈতন্যদেব একটা আবেগ, তেমনি দীঘায় বেড়াতে আসা পর্যটকদের অনেকেই এই মন্দির দর্শনে আসেন, পূজো দেন। চৈত্র মাসে মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে। স্থানীয়রা অনেকদিন ধরেই এলাকাটিকে নিয়ে পর্যটনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি করছেন এবং সেই সম্ভবনার কথা মাথায়ে রেখে মন্দির পরিচালন কমিটি একটি গেস্ট হাউসও তৈরি করেছে।[7] হয়তো এটি ভবিষ্যতে খুব তাড়াতাড়ি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।..... এইভাবেই দেখা যাচ্ছে বিরহী গ্রামের মদনগোপালের মন্দির এবং পায়া মেদিনীপুরকে কেন্দ্র করে কীভাবে একটি আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

আধুনিক অর্থনীতির গবেষণাতে একটি বিষয়ে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, একটা মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তথা কর্মসংস্থান গড়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ অর্থনীতি ক্ষেত্রে মন্দির সেবায়েত বা পুরোহিত শ্রেণী, সহযোগী সেবায়েত, মন্দির পরিচালকবর্গ, যার মধ্যে রয়েছে মন্দির ব্যবস্থাপক আধিকারিক, হিসাব রক্ষক সহ অন্যান্য কর্মীদেরকে বোঝান হয়েছে। এখানে পরোক্ষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বলতে বিগ্রহ বা মূর্তি নির্মাণকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে টেরাকোটার একটা বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে অন্যতম হল কুমোরটুলি। অন্য আরও একটি বৃহৎ কারিগরি শিল্প গড়ে উঠেছে ঠাকুরের পোশাক ও অলঙ্কারকে কেন্দ্র করে। মন্দিরের পূজা সামগ্রী যেমন- ধুপকাঠি, মিষ্টি সামগ্রী, ফুল-ফল, ইত্যাদি সামগ্রীর ভিন্ন ভিন্ন বাজারকে কেন্দ্র করেও একটি অর্থনৈতিক আবর্ত গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র পূজোসামগ্রীই নয়, মুদ্রণ শিল্পকেও প্রভাবিত করে, যেমন- ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক গ্রন্থাবলী ও দেবদেবীর বাঁধানো ছবি ইত্যাদির বাজার অত্যন্ত জনপ্রিয়। মন্দিরের বিশেষ উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা সংগঠিত হয় যেমন- ঠাকুরনগরের মেলা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে পশ্চিমবঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ মেলাকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে বিশেষত গ্রাম বাংলায়। এই মেলা অর্থনীতির ৯০% গড়ে ওঠে কোন না কোন মন্দির তথা ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু ধর্মীয়স্থানের বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার সুবাদে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। যেমন- কালীঘাটের মায়ের মন্দির, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, তারকেশ্বর এবং নবদ্বীপ ও মায়াপুরধাম, যা বৈষ্ণব তথা ইস্কন মন্দির গুলির আকর্ষণে সমস্ত বিশ্বব্যাপী পর্যটক ও ভক্তগনের সমাগম যা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে অনেকটাই প্রভাবিত করে। বর্তমানে বেশকিছু গবেষণাতে উঠে এসেছে যে বিপুল অংশের জনগোষ্ঠী এই মন্দির-অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যা বংশ পরম্পরাতে চলে আসছে। ভারতবর্ষের আদমশুমারি ২০০১ এর থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে মন্দিরের জনপ্রিয়তার একটা আভাস পাওয়া যায়, যেখানে দেখানো হয়েছে ১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় পূজার স্থান ছিল ১,৪৯,৯৭৫ যা ২০০১ সালে

[7] বিরহীর মদনগোপালের মন্দির, (২০২২, মার্চ ২৪) বর্তমান সংবাদ পত্র, ১২ ।

বেড়ে হয় ২,২৮,৪৫২ অর্থাৎ বছরে গড়ে ০.০৫২ % হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।[8] যার মধ্যে সবথেকে বেশী বৃদ্ধির হার হল যথাক্রমে মেদিনীপুর, বর্ধমান, ও বাকুড়া।

"Market of Religion in West Bengal" গবেষণাপত্রে অধ্যাপক তুহিন কুমার দাস ও গবেষক ইশিতা দত্ত রায় পশ্চিমবঙ্গের মন্দির গুলোকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন- C1- এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মন্দির গুলি হল রাস্তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্ষুদ্রপরিসরে নতুন ছোটছোট মন্দির গড়ে ওঠে, যেখানে ভক্তদের পূজোতে অংশগ্রহণের মত পর্যাপ্ত ও সঠিক স্থান নেই। এই মন্দির গুলি স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক সংগঠন বা কর্মহীন কিছু ব্যাক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাঁদের কিছু অর্থ সংকুলানও হয়। C2 - এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মন্দির গুলি কয়েকটি প্রাচীন, আর কিছু রয়েছে কয়েক বছরের পুরনো, যাইহোক এখানে একটা তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যায় ভক্ত গনের আগমন ঘটে এবং তাঁরা সেখানে বেশ কিছু অর্থ সহ অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রীও উৎসর্গ করেন। উল্লেখ্য যে এই শ্রেণির মন্দির গুলি সংগঠিত হয় এবং এদের হিসাবরক্ষকও থাকেন। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মন্দির গুলির মধ্যে অন্যতম হল সাউদার্ণ এভিনিউর 'লেক কালীবাড়ী', গড়িয়ার ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, রাজপুরের বিপদতারিণী মন্দির। C3-এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মন্দির গুলির আকর্ষণে একটা বিপুল সংখ্যায় ভক্তগণের আগমন ঘটে, যা ধীরে ধীরে একটা পর্যটন কেন্দ্র রূপে স্বীকৃতি লাভ করল। এই মন্দির গুলিতে বিপুল সংখ্যায়ে অর্থ সঞ্চারের কারণে এইগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সংগঠনের মতো কাজ করে, যেমন- কর্মসংস্থানে বিভিন্ন পদের সৃষ্টি, সরকারকে কর প্রদান ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীর মন্দির গুলিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু দোকান গড়ে ওঠে যা কিছু পূজা অর্চনা সম্পর্কিত উৎপাদনশীল শিল্প গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান করেছে। এই শ্রেণির মন্দির গুলি হল- কালীঘাট মন্দির, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, তারকেশ্বর মন্দির ইত্যাদি। গবেষক তুহিন কুমার দাস ও ইশিতা দত্ত তাঁদের গবেষণা পত্রে সংখ্যা তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ধর্মীয় বাজারের ক্রমোন্নতিকে আরও দৃঢ় করছে যা থেকে এটা অনুমান করা যুক্তিসংগত যে, এখানে চাহিদার কারণে এক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক এবং অনুমান করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে মন্দির সেবায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা নতুন প্রবণতার সৃষ্টি হবে, যেখানে অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের এক আত্তীকরণ ঘটবে, যেমন ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তদের বীমার প্রচলন এরই ইঙ্গিত দেয়।[9]

সংস্কৃতি সর্বদাই সামাজিক সচ্ছলতার দ্বারাই প্রভাবিত হয়। প্রাচীনকালে গণমাধ্যম তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি, তবে মন্দির একটা গণমাধ্যম হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিত, কারণ ওই সময় সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ নিত্য মন্দির প্রাঙ্গণে আসতেন এবং এখান থেকে অর্থাৎ মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী যা আমাদের বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এছাড়াও মন্দিরের পুরোহিতরাও বিভিন্ন সময় নীতি শিক্ষা প্রদান করতেন, অনেকক্ষেত্রে মন্দিরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পালাগান হত, যেখানে রামায়ণ, মহাভারত,ও বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীকে গান ও কথার মাধ্যমেই চিত্রায়ন করা হত, যার ঐতিহ্য বংশ পরম্পরায় আমরা আজও বহন করে চলেছি। এই ভাবেই অতীতের সাথে বর্তমানের সংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ক্ষেত্রে মন্দির কিন্তু একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

[8] Published in West Bengal Economy: Some Contemporary Issues, Ed. A Raychaudhuri and T. K. Das, New Delhi: Allied, 2005, pp. 470–500.

[9] Ibid.

তুর্কী অভিযানের পর বাংলাতে মন্দির সংস্কৃতির কিছুটা ভাটা দেখা গেলেও চৈতন্যোত্তর কালে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে প্রায় ৩০০ বছর ধরে বাংলাতে প্রচুর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই সময় বাংলাতে এক নিজস্ব ধারা- ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। উচ্চমানের বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনই মন্দির স্থাপত্যে ও শিল্পকলাতেও এক নতুন শৈলী গড়ে ওঠে। বর্ধমান, বাকুড়া, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর-র বহু স্থানে এই নতুন শৈলীর মন্দির গড়ে ওঠে। আলোচ্য সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এক প্লাবন দেখা দিয়েছিল, যা আজও এবং ভবিষ্যতেও সমগ্র বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির ধারাকে প্রভাবিত করে চলেছে ও চলবে। শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর অবশ্যই বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্লাবন ঘটেছিল, তবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, এই প্লাবনের ভিত্তি ভূমি কিন্তু প্রাক চৈতন্য পর্বেই তৈরি হচ্ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক কৃষ্ণ মন্দির গুলিকে কেন্দ্র করেই, আর এই কৃষ্ণ বা বিষ্ণু ধর্মমতেরই এক নব সংযোজন হল বৈষ্ণবধর্ম। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর প্রেম ভাবাবেগ মিশ্রিত কীর্তনের মাধ্যমেই বাঙালির আধ্যাত্মপ্রবণ মনকে আরও জাগিয়ে তোলে, যে জাগরণ ক্রমান্বয়ে বাংলা থেকে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বকে জাগিয়ে তুলেছে। পাশাপাশি বৈষ্ণব কীর্তন আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, যার জনপ্রিয়তা কালানুক্রমে বেড়েই চলেছে। এইভাবেই বাংলাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মন্দির ও সংস্কৃতিক মূল্যবোধ একে অন্যকে আশ্রয় করে বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

তথ্য সূত্র:

১) রায় প্র. (১৯৯৯) বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য -পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ।

২) মুখোপাধ্যায় রা,(১লা বৈশাখ, ১৩৪৭) বাঙলা ও বাঙালী,রসচক্র সাহিত্য কলকাতা, ।

৩) সেন সু,(শ্রাবণ, ১৩৫২) মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী, বিশ্বভারতী চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা, ।

৪) Raychaudhuri A (Ed.), Das T,(2005) West Bengal Economy: Some Contemporary Issues, New Delhi: Allied, 2005, pp. 470–500.

৫) Radhakrishnan, (1947) "Religion and Society". George Allen and Unwin Ltd., London, page 125.

৬) Rajanish B, (1993) "Tantra Vision: The door to Nirvan." Dimond Pocket Books (P) Ltd., 2715 Darya Gan.j, New Delhi - HOO02, Page 12-13.

৭) Mishra K,(1971) "The Cult of Jagannath". Firma K.L. Mukhopadhya 6/1 a, Dhiren Dhar Sarani, Calcutta, Page 14.

৮) Gandhi M,(1989) "The Necessity of Temples" Article in the Book "Symbolism in Hinduism" compiled by R.S. Nathan, Central Chinmaya Mission Trust, Bombay, 2nd Edition, Page 37.

৯) বিরহীর মদনগোপালের মন্দির, (২০২২, মার্চ ২৪) বর্তমান সংবাদ পত্র, ১২।

১০) মহাপ্রভুর স্মৃতি আঁকড়ে, (২০২২, মার্চ ২৪) বর্তমান সংবাদ পত্র, ১২।

১১) বাঙ্গালীর সংস্কৃতি', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ পৃ. ৭-৮, ১৯৯০।